ভূমিকা

সাহিত্য সমাজের রূপ প্রতিফলিত করে। জীবনের বাইরের এবং ভেতরের দুটো রূপই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এক শৈল্পিক আধারে। মানুষের জীবনের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সমস্ত কিছুই একটি সাহিত্যের জন্ম দেয়। মানব জীবনের একাধিক ঘটনা এবং অনুভূতি নিয়ে এভাবেই তৈরি হয় উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাস যেন সমাজের আয়না। জগৎ এবং জীবনকে নিয়ে বিভিন্নভাবে যেন পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরাই ঔপন্যাসিকের প্রধান দায়িত্ব। প্রবহমান সময়ের প্রতিটি বিভঙ্গে রয়েছে নানা তাৎপর্য। পাঠক তা অনুভব করে উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় পাতায়। সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের কথাই উঠে এসেছে সমানভাবে। পুরুষ কখনও নারীকে চেয়েছে তার সম্পদের মতো কুক্ষিগত করতে, আবার কখনও প্রতিবাদ করতে গিয়ে নারীরা হয়েছে বিধ্বস্ত, অপমানিত। নিরাপত্তাহীনতার ভয় দেখিয়ে নারীদের দিনের পর দিন ইচ্ছার দাস বানিয়ে গেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। আবার কখনও এক নারীই হয়ে উঠেছে অন্য নারীর চরম শত্রু। নারীর প্রতি নারীর এই ঈর্ষাবোধ সমাজ খুব সূক্ষ্মভাবেই স্থাপন করেছে নারীর অন্তরে। নারীদের চেতনা দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত এবং অনুচ্চারিত হয়ে থেকেছে।

পুরুষ সাহিত্যিকরা নারীর কথা তাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চাইলেও একজন নারী সাহিত্যিক যে নারীর মননকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে বেশি সাবলীল তা মেনে নেওয়া যেতেই পারে। শিল্পীর সহজাত শিল্পবোধ এবং মননের সহজতায় উন্মোচিত হয় নারীর আত্ম-অনুসন্ধানের বিভিন্ন স্তর। নারী চেতনাবাদী তত্ত্বের ধারণা যত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে বোধগম্য হয়েছে ততই সাহিত্যেও যুক্ত হয়েছে নারীকেন্দ্রিক চিন্তার নানা স্তর। নারীর মানবী অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীর আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্ন পেয়েছে ভাবনার নতুন নতুন স্বতন্ত্র মাত্রা। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে নারীর কলম ঊনবিংশ শতক থেকেই সরব

হলেও বিংশ শতকে তা যেন অন্যমাত্রা পায় যেখানে নারীর অভিব্যক্তি তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক পটভূমি রচিত হয়। নারীর এই আত্ম-অনুসন্ধান এবং নিজের প্রত্যয়ের মাধ্যমে ভাগ্যকে জয় করার অধিকার বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও বাণী বসু নিজেকে নারীবাদী সাহিত্যিক বলার বিরোধী তবুও নারী সাহিত্যিক হওয়ার জন্য বাণী বসুর উপন্যাসের নারীরা এক বিশেষ স্থানে উন্নীত। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাতায়াতের মাধ্যমে তিনি নিজেকে কখনই একই গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি। তার প্রতিটি সৃষ্টির ভিন্নতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই ''বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর আত্ম-অনুসন্ধান'' এই শিরোনামে আমার গবেষণা সন্দর্ভটি তৈরি করেছি। বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা নারী চরিত্রগুলোকে তিনি যেভাবে নিজস্ব আঙ্গিকে এবং জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন তা অনন্য। বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর মধ্য দিয়ে চলার সময়ে নারী কীভাবে নিজের অবস্থান এবং আত্মপরিচয় খুঁজে চলেছে তা উপন্যাসের প্রতিটি স্তরে উন্মোচিত হয়েছে।

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর উপস্থিতি নানা পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারায় পুষ্ট। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে ধূলিসাৎ করে বাণী বসুর নারীরা এগিয়ে গেছে জীবন থেকে মহাজীবনের পথে। নারীকে বাণী বসু দেখার চেষ্টা করেছেন অন্তরের অন্তঃস্থলের আলোছায়ায়। চারিদিকে ব্যাপ্ত নৈঃশব্দের এক বলয় ভেঙে দেওয়ার আয়োজন, নিজেদের অস্তিত্বের যথার্থতা নির্ণয়ের প্রবণতা বাণী বসুর উপন্যাসে লক্ষণীয়। বাণী বসুর উপন্যাস রচিত হয়েছে নারীর গভীর তীব্র আত্মসন্ধান নিয়ে, সম্পর্কের অজস্র বিন্যাসের ভেতরকার সংশয় ও উত্তরণের দ্বন্দ্ব নিয়ে। তিনি তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে নারীর বাস্তব অবস্থানের ভেতরকার তৃপ্তি-অতৃপ্তি, পূর্ণতা-শূন্যতাকে নির্মাণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। পিতৃতন্ত্রের দৃশ্য এবং অদৃশ্য প্রতাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। তিনি সেই বেড়াজাল থেকে নারীসত্তাকে উন্মুক্ত করে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক নারীচরিত্রই জীবনকে নতুন করে দেখার এবং

জানার তাগিদ নিয়ে এগিয়ে গেছে, তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে নানা জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা থেকেই বাণী বসুর উপন্যাসের নারীরা নিজেদের আত্মিক অবস্থান খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছে। নারী-পুরুষের বেড়াজাল ভেঙে নারীরা হয়ে উঠেছে রক্তমাংসে গড়া মানবীসত্তা নারী চরিত্রগুলিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে। নারী তা সে বর্তমান বা পুরাণ-ইতিহাস যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, তথাকথিত নিম্নস্তর কিংবা উচ্চস্তরের হোক— তাদের অন্তঃকথনকে বাণী বসু তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন নারীকে তিনি বিভিন্ন পরিসরে, নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করে নারীর নিজস্ব সত্তাকে চেনার পথ তৈরি করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে লেখার দরুণ ঔপন্যাসিকের সামনে অভিজ্ঞতার কোনো ঘাটতি ছিল না। এই সমস্ত ভাবনা সর্বোপরি অবক্ষয়ী আধুনিকতা বাণী বসুর লেখায় এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। তিনি নিজের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন বয়সের দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যদিও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিপুণ কৌশলে যে সব চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধের বীজ আমাদের মনে বপন করেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। কারণ আমাদের চিন্তা-চেতনাও সেই স্রোতেই প্রবাহিত হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ সভ্যতার শুরুতে অধিকাংশ সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক যেখানে শাসন এবং শোষণের মাত্রা এখনকার মতো প্রকট ছিল না। ক্ষমতার হস্তান্তর যখন থেকে পুরুষের হাতে চলে আসে তখন থেকেই নারীকে অন্দরমহল সামলানোর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার অবক্ষয় শুরু সেখান থেকেই। তাই সভ্যতার বহুযুগ অতিবাহিত হলেও আধুনিক যুগেও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য নারীদের পরনির্ভরশীল হতে হয় আজও। দেশ-কাল, পরিবেশ-প্রতিবেশ, সমাজ-ধর্ম নির্বিশেষে নারীরা নিজেদের আত্ম-অনুসন্ধানে কতখানি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সেগুলি আলোচিত অধ্যায়গুলির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে নয় বরং নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে নারীর আত্ম-অনুসন্ধানে যেভাবে পাশে থেকেছে তাও

তিনি তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। নারীর বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার অনুবীক্ষণে অর্জিত সেই আত্ম-অনুসন্ধানকেই তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণা সন্দর্ভটিতে।